BANGLA KOUNTERKULTURE ARCHIVE MAGAZINE

ODDJOINT

003 / JUNE 2015

স্ল্যালালঙ্কার একটি হাংরি অবদান	মলয় রায়চৌধুরী	৩
তুষার রায়ের কবিতা		৬
প্রসিদ্ধ বিবেক ও অলৌকিক কবরখানা	নবারুণ ভট্টাচার্য	১০
কবিজীবনী	সুরজিৎ সেন	১১

কভার ফটো: কিউ

ODDJOINT # বাংলাস্ল্যাং

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

আষাঢ় ১৪২২ ● জুন ২০১৫

১. স্ল্যালালঙ্কার একটি হাংরি অবদান মলয় রায়চৌধুরী

ছবি: সম্বরণ দাস

কিছুকাল আগে উত্তর ভারতে একটি গান বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, 'ভাগ ভাগ ডি কে বোস', কিন্তু উর্দু-হিন্দীভাষী পাড়া ছাড়া পশ্চিমবাংলার অন্যত্র তত পাত্তা পায়নি, তার কারণ গানটিতে যে গালাগাল লুকোনো আছে তা এবং ও-বে দুই বঙেই অপ্রচলিত। গানটা দ্রুত গাওয়া হয়েছিল, এইজন্য যে তাহলে বাক্যটা এরকম শোনাবে, 'ভাগ ভোঁসড়িকে ভাগ'। ইন্টারনেট সার্চ করে দেখলাম যে বাংলাদেশীরা যে-যার নিজের সাইটে সেদেশে প্রচলিত গালাগাল (কেউ-কেউ তাকে ভুল করে লিখেছেন স্ল্যাং) অন্তর্ভুক্ত করলেও তাতে 'ভোঁসড়ি' শব্দটা নেই, যদিও 'চুত' শব্দটা আছে, 'চুতিয়া' নেই। তাছাড়া বাংলাদেশী গালাগালগুলোর অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে ও শহরে ঘোরাঘুরির সময় শুনিনি, দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু এলাকাতেও শুনিনি। অন্ত্যজ বিহারি ও কাঙাল মুসলমানদের ইমলিতলা পাড়ায় শৈশব কেটেছিল আমার, সেখানে যে হিন্দি গালাগালি প্রয়োগ হতো, সেগুলোর বেশ কয়েকটা অবশ্য পশ্চিমবাংলায় শুনেছি; নাকতলায় ছ'বছর কাটিয়ে টের পেয়েছি যে বাঙালি পাড়াতেও হিন্দির যৌন-গালমন্দই প্রয়োগ করেন ছেলে-ছোকরারা।
গালাগাল (swear words) বা খিস্তি (abusive words) আর স্ল্যাঙের তফাত আছে। গালাগাল কাউকে অবমাননা কিংবা মানসিক আঘাত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়। কেউ যখন গালাগালটি কারোর উদ্দেশ্যে প্রয়োগ না করে, নিজের কথাবার্তার বিশেষ ঝোঁকের জন্য ব্যবহার করেন, তখন অভিব্যক্তিটি খিস্তি হয়ে ওঠে। কাউকে 'খিস্তি করলে' তখন তা গালাগাল।
'স্ল্যাং' শব্দটি ইংরেজি অভিধানে প্রবেশ করেছিল ১৭৫৬ সালে, ব্রিটেনে ইনডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশানের সময়ে, যখন অজস্র শ্রমিকদের নিয়ে গড়ে উঠতে লাগল নতুন শহুরে এলাকা, আর শ্রমিকরা, তাদের পারস্পরিক আদানপ্রদানের বুলিতে, নিজের নিজের এলাকা থেকে

নিয়ে এলেন সমাজের নিচুতলার শব্দভাঁড়ার। ইনডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশানে যেমন পুঁজিপতি-শ্রমিকের বিভাজন সৃষ্টি করল, তেমনই সৃষ্টি হল বাকজগতের বিভাজন। ১৭৫৬ সালে অভিধানে অন্তর্ভুক্তির সময়ে 'স্ল্যাং'-এর মানে দেয়া হয়েছিল 'ভোকাবুলারি অফ লো অর ডিসরিপুটেবল পিপল'। কেবল নিচুতলার নয়, তাদের কুখ্যাতি বা বদনামকে চিহ্নিত করবার জন্য অভিব্যক্তিটা লক্ষ্য করার ব্যাপার।

ভাষাতাত্ত্বিক বেথনি ডুমাস এবং জোনাথান লাইটার তাদের 'ইজ স্ল্যাং এ ওয়ার্ড ফর লিংগুস্টস' গ্রন্থে লিখেছেন যে স্ল্যাং হল একটি বিশেষ গোষ্ঠীর আইডেনটিটি গড়ার 'ইনসাইডার স্পিচ' এবং সমাজের উঁচুতলার দায়িত্বশীল লোকেদের ডিসকোর্সে তা ট্যাবু। ১৭৫৬ সালে, খ্রিষ্টধর্মের রমরমার দিনে, ট্যাবুর অর্থ ছিল 'অপবিত্র'। বেথনি ও জোনাথান যখন বইটি লিখছেন (১৯৭৮) তখন ট্যাবু মানে 'যে কাজ বা কথা নিষিদ্ধ বা অলঙ্ঘনীয়'। কিন্তু কেনই বা নিচুতলার মানুষ বা বদনাম মানুষ নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের বুলিতে স্ল্যাং প্রয়োগ করে? তারা, সচেতনভাবে, বা অবচেতনের প্ররোচনায়, তা প্রয়োগ করে শিষ্ট ভাষায় অন্তর্ঘাত ঘটাবার জন্য, সমাজের প্রতিষ্ঠিত ভাষাকে আক্রমণ করার মাধ্যমে উঁচুতলাকে বিদ্ধস্ত করার উদ্দেশ্যে। ডুমাস ও লাইটার লিখেছেন যে স্ল্যাং শব্দগুলোকে জারগনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ভুল হবে।

স্ল্যাং ব্যবহারের মাধ্যমে গোষ্ঠীবিশেষরা তাদের 'ইনডেক্সিক্যালিটি' গড়ে তোলে, যে কারণে একটি গোষ্ঠীর ব্যবহৃত স্ল্যাং আরেকটি গোষ্ঠীর কাছে দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে। ওপরে বর্ণিত 'ভোঁসড়ি' অভিব্যক্তিটির মতন। যে দেশগুলোয় ইংরেজিভাষীদের বসবাস, যেমন ব্রিটেন, কানাডা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউনিল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইত্যাদি, এক দেশের স্ল্যাং অন্য দেশের বুলিতে ঢোকার সুযোগ সমান্তরালভাবে পায় না। জুলিয়া কোলম্যান তার 'লাইফ অফ এ স্ল্যাং' (১৯৬৬) গ্রন্থে লিখেছেন যে, সাধারণত একটা স্ল্যাং সে দেশের বুলিতে যদি দশ বছর টিকে যায়, তাহলে তা ক্রমশ শিষ্ট ভাষায় ঢুকে পড়ে, এবং বিদ্যায়তনিক স্তরে গৃহীত হয়। গালাগাল, খিস্তি, স্ল্যাং যদি শিষ্ট ভাষায় প্রবেশ করে, তাহলে তাদের ধার ভোঁতা হয়ে যেতে থাকে।

মার্কিন সাহিত্যিক নরম্যান মেইলার ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত সৈন্যবাহিনীতে তার অভিজ্ঞতা নিয়ে 'দ্য নেকেড অ্যাণ্ড দি ডেড' উপন্যাসে 'ফাক ইউ' 'মাদারফাকার' ইত্যাদি শব্দগুলো লেখার সাহস যোগাতে পারেননি বলে 'ফাগ ইউ' 'মাদারফাগার' ইত্যাদি লিখে চালিয়েছিলেন, কেননা তখনও মার্কিন সমাজের প্রতিটি স্তরে শব্দটা প্রবেশ করেনি। তিনি একজন সাহিত্যিক হয়ে অমন হেরো কাজ করেছিলেন বলে সমালোচকরা সে সময়ে তাকে তুলোধোনা করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে বইটির গল্প নিয়ে তৈরি ফিল্মে অবশ্য চরিত্ররা 'ফাক' শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন। আসলে ততদিনে বিট আন্দোলন ও হার্লেম রেনেসাঁসের কবি-লেখকরা তাদের লিটল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা গালাগাল, খিস্তি, স্ল্যাং দিয়ে ছেয়ে ফেলেন; খোলাখুলি যৌন ড্রইংও তারা প্রকাশ করেছিলেন। তারা উৎসাহিত হয়েছিলেন মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের এই কথাগুলো থেকে 'স্ল্যাং ইজ দ্য স্টার্ট অফ ফ্যান্সি, ইম্যাজিনেশান অ্যাণ্ড হিউমার, ব্রিদিং ইনটু ইটস নসট্রিলস দি ব্রেথ অফ লাইফ' (কালেক্টেড প্রোজ, ১৮৯২)।

সম্প্রতি সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও পরিণতি চোপড়া অভিনীত 'হাসি তো ফাসি' নামের হিন্দি ফিল্মটির প্রচারে বলা হয়েছিল যে তা 'কাকিং ফ্রেজি' ফিল্ম। শব্দটি 'ফাকিং ফ্রেজি', যা ব্যবহার করলে আমাদের দেশের সেনসর বোর্ড কর্তারা নির্ঘাত হাতে কাঁচি তুলে নিতেন। বাজারে পোশাকের একটা ব্র্যাণ্ড এসেছে, Fuck নামে। অর্থাৎ মধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রণে যে পপুলার যোগান-চাহিদার ক্ষেত্র, সেখানে মার্কিন গালাগাল, খিস্তি, স্ল্যাং প্রবেশ করে গেছে, বাজারের মাধ্যমে। মার্কিনদেশে ওগুলো সমাজের নিচুতলা থেকে ওপরে গিয়েছিল। সেদেশে এখন রাষ্ট্রপতি, সেনেটর, আমলা, পুলিশের লোক, সকলেই নির্দ্বিধায় ফাক, আসহোল, সান অফ এ বিচ ইত্যাদি প্রয়োগ করেন। কিছুকাল আগে তাদের মহিলা কূটনীতিক ইউরোপীয় ইউনিয়ানের প্রতিনিধিকে 'ফাকিং ইউরোপিয়ান্স' বলায় বেশ জলঘোলা-গোঁসাগোঁসি হয়েছিল।

আমাদের দেশে নেহেরু-বিধান রায়ের সময়ের রাজনীতিকদের যে বিলাতে শিক্ষিত উৎসভূমি ছিল, তা থেকে ক্রমশ নিম্নবর্গের দিকে তা চলে গেছে; সমাজ হয়ে গেছে আরবানাইজড, বহু এলাকা থেকে জনগণ হয়ে গেছে উৎপাটিত, গণমাধ্যমের অকল্পনীয় প্রসার ঘটেছে। বিহার-উত্তরপ্রদেশ-হরিয়ানা-রাজস্থানের এখনকার, উঁচু-নিচু নির্বিশেষে, প্রায় সব রাজনীতিকের মুখে 'ভ্যায়েনচো' শব্দটা তাদের আড্ডায় প্রতিনিয়ত শোনা যায়।

মাইকেল অ্যাডামস তার 'স্ল্যাংস—দি পিপলস পোয়েট্রি' (২০০৯) গ্রন্থে লিখেছেন যে স্ল্যাং হল প্রতিদিনকার কথাবার্তার কবিতা, এবং ভাষাকে শিল্পের শিখরে তুলে নিয়ে যাবার উদ্ভাবনী ক্ষমতার জন্য স্ল্যাংকে অভিবাদন জানানো উচিত; স্ল্যাং হল মূল স্রোতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের হাতিয়ার, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতাধারীদের বিস্থাপিত করার সাধিত্র। বিশেষ-বিশেষ স্ল্যাং অভিব্যক্তি, যারা সেগুলো ব্যবহার করে না বা করতে লজ্জা পায়, তাদের হেনস্থা করার জন্য, জ্বালাতন করার জন্যই ওই স্ল্যাংগুলোকে উদ্ভাবন করা হয়। স্ল্যাং মানেই যে তা যৌন অভিব্যক্তি থেকে পয়দা হয়েছে, এমন নয়, বলেছন মাইকেল অ্যাডামস; যৌন অভিব্যক্তিগুলো প্রয়োগ করা হয় মর্মার্থে 'শক' দেবার ক্ষমতার জন্য; সেই শব্দগুলো সেক্সিস্ট নয়, বরং অপরপক্ষের পিতৃতান্ত্রিক কৌমপ্রতাপকে খর্ব করার বোমাবারুদে টইটম্বুর। যাদের মগজ থেকে ওই অভিব্যক্তিগুলো তৈরি হয়, তাদের প্রশংসা করা উচিত, লিখেছেন অ্যাডামাস, কেননা তারা আমাদের দেখায় যে ভাষাবিশেষে সাংস্কৃতিক সংঘাতের জন্য খেলা করার কেমন ফাঁকা এলাকা পড়ে আছে; মানুষের সহজাত উদ্ভাবনীশক্তির কথা সমাজকে প্রতিনিয়ত জানাতে থাকে, ভাষার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্ল্যাংগুলো চোখ মেরে দিয়ে চলে যায়, এবং ভাষার উদ্ভাবনার ক্ষেত্রটি মূলত কবিদের। কবিরা যেমন সাহিত্যিক কৌশল ব্যবহার করেন, তেমনই স্ল্যাং ব্যবহারকারীরা স্ল্যাঙের মাধ্যমে উপস্থাপন করে রূপক, উপমা, অনুপ্রাস, পরাবৃত্ত, ধ্বনিক্রিড়া, লক্ষণালঙ্কার, সিনেকডাকি ইত্যাদি। সমাজে উঁচু স্তরে 'জারগন' তৈরি হয়, কিন্তু গালাগাল, খিস্তি, স্ল্যাং সাধারণত জন্মায় সমাজের সাবকালচারে; অভিব্যক্তিগুলো যতদিন সমাজের বাইরে থাকে ততদিন তা কাউন্টার ডিসকোর্সের কাজ করে। যেহেতু কাউন্টার ডিসকোর্স, সেহেতু সংস্কৃতির অভিমানে লালিত প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিতে তাকে মনে করা হয় অশ্লীল।

কনি এলবি তার ‘স্ল্যাং অ্যান্ড সোশিয়েবিলিটি ইন-গ্রুপ ল্যাংগুয়েজেস অ্যামাং কলেজ স্টুডেন্টস’ (১৯৬৬) গ্রন্থে লিখেছেন যে, শোষিত যেমন শাসক বিরোধিতার জন্য গালাগাল, খিস্তি, স্ল্যাং উদ্ভাবন করে, তেমনই যুবক-যুবতীরা তাদের পারস্পরিক আদানপ্রদান এবং গোষ্ঠী আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য নিজেদের সময়কে চিহ্নিতকারী ‘ইশারাশব্দ’ গড়ে তোলেন, যা কালক্রমে তাদের প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে, এবং স্ল্যাঙের আদল পায়। যুবক-যুবতীদের কাছে স্ল্যাং বিশেষের মর্মার্থ তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কীভাবে প্রয়োগ করা হল, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ শব্দমাধ্যমটি নিজেই হয়ে দাঁড়ায় ‘বার্তাবিশেষ’। বার্তাটির অন্তর্গত যে সাবটেক্সটি পাওয়া যায়, তা হল বক্তা ও শ্রোতা একটি গোষ্ঠী বা দলের বা শ্রেণির সদস্য।

হাংরি আন্দোলনের সময়ে আমরা আকছার গালাগাল, খিস্তি, স্ল্যাং প্রয়োগ করতুম, বিশেষ করে হ্যান্ডবিলের মতন ফালিকাগজে, সুবিমল বসাক যেগুলো ওর দপ্তরে স্টেনসিল করতো সেই বুলেটিনগুলোয়, ত্রিদিব মিত্রের ‘উন্মার্গ’ এবং ‘ওয়েস্ট পেপার’ পত্রিকায়। সেসময়ে ষাটের দশকের শুরুতে, কলকাতার প্রাতিষ্ঠানিক কর্তাব্যক্তিরা বেজায় চটেছিলেন একটি বিয়ের কার্ডে ছাপানো এই বাক্যটির জন্য ‘ফাক দি বাস্টার্ডস অফ গাঙশালিক স্কুল অফ পোয়েট্রি’; তার কারণ সংস্কৃতি-অভিমানী স্তরটিতে তখনও ‘ফাক’ এবং ‘বাস্টার্ড’ গৃহীত হয়নি। তখনকার কোনো কোনো প্রবীণ বুদ্ধিজীবী এই ভেবে অপমান বোধ করেছিলেন যে তাদের বটানিকাল পোয়েট্রিকেই বলা হচ্ছে ‘গাঙশালিক স্কুল অফ পোয়েট্রি’। এখন কোনো কবি বা লেখক এই কথাগুলো লিখলে তা ফালতু মনে হবে, কেননা সমাজে ঢুকে গিয়ে ওই স্ল্যাং ও গালাগালি তাদের আক্রমণক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

হাংরি আন্দোলনের আগে প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণের জন্য, ক্ষমতাগর্বী সাহিত্যিক-সম্পাদক-অধ্যাপকদের ছড়ি ঘোরাবার মৌরসিপাট্টাকে হেনস্থা করার জন্য, সাহিত্যের শিষ্টভাষাতে অন্তর্ঘাত ঘটাবার জন্য, মেইনস্ট্রিমের ডিসকোর্সকে ফুটো করার জন্য, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সৃজনশীল লেখালেখিতে গালাগাল, খিস্তি, স্ল্যাং ব্যবহার করার সাহস কেউই দেখাতে পারেননি। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙালির ডিসকোর্সটি উচ্চবর্ণের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ার, নিম্নবর্গের প্রাকঔপনিবেশিক ডিসকোর্সটি লোপাট হয়ে গিয়েছিল। হাংরি আন্দোলনে আমি তফশিলিপাড়া ইমলিতলা থেকে, সুবিমল বসাক পাটনার দরিদ্রপাড়া দুরুক্ষি গলি থেকে, দেবী রায় হাওড়ার স্লাম থেকে, সুভাষ ঘোষ বালুরঘাটের উদ্বাস্তু কলোনি থেকে এসেছিলুম। অর্থাৎ মূল সংস্কৃতিতে আমরা ছিলুম ‘আউটসাইডার’। স্বাভাবিক যে তখনকার প্রাতিষ্ঠানিক সন্দর্ভের সঙ্গে সংঘাত আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল প্রথম বুলেটিন থেকেই। তারপর তো অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট, লালবাজার, লকআপ, হাতকড়া, আদালত, সাক্ষীসাবুদ, জেল-জরিমানা ইত্যাদি।

সে সময়ে, ষাটের দশকে, হাংরিদের প্রয়োগ করা বাঞ্চোৎ, বোকাচোদা, বাল, পোঁদ, গু, মুখে মুতি, পুটকি মারি, বাঁড়া, নরক কিচাইন, শুয়োরের পালা, মাদারচোদ, খানকিবোঁটা, মাল, গুদ, পাদ, লেড়িয়ে গেছি, মাই, খোকোনপোঁদা, এমসিবিসি, ফাটবুকনি, ঢপকুমার, ফাকাফাকি, পেছন মারি, লাইনমারুয়া, পোঁদ ধুইয়ে, লুণ্ড হয়ে থাকব, থুতুচাতণ, চুষকি, রস-কচলআ, পেঁয়াজি, নাগুলা, হাত মারলে রস পড়ে না, ছেমড়ি, গালফুলো গোবিন্দ ইত্যাদি অভিব্যক্তির ভেতরে পোতা থাকত নাস্তানাবুদ করার ক্ষমতা। বলাবাহুল্য সেগুলো ছিল যৌবনের ‘কোর এলিমেন্ট’।

হাংরি আন্দোলনের পরের প্রজন্মগুলোয় গালাগাল, খিস্তি, স্ল্যাং নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে লেখালেখিতে; পড়তে আক্রমনাত্মক লাগলেও, সেগুলো স্রেফ নব্যালঙ্কার হিসাবে উপস্থাপিত হচ্ছে; যাদের আক্রান্ত হবার কথা তারা অপমানিত বোধ করার বদলে সেগুলো বিদ্যায়তনিক আহ্লাদে সীমিত রাখছেন। যেমন এই কটা লাইন হাংরি আন্দোলনের সময়ে কোনো আন্দোলনকারী লিখলে, লালবাজারের প্রেস সেকশানের যে ইনফরমাররা কফিহাউসে ঘোরাঘুরি করে, তারা নিয়ে গিয়ে নালিশখাতায় নথি করে রাখত, প্রতিষ্ঠানের বিগ বসরা টেলিফোন টেপাটিপি করে প্রশাসনকে জানাতেন বঙ্গসমাজ কতটা উচ্ছন্নে চলে যাচ্ছে। কিন্তু তা হবার মতন মনন-পরিসর উবে গেছে, সমাজটাই পুরোপুরি পাল্টে গেছে। বস্তুত বর্তমান কালখণ্ডে সরাসরি গালমন্দ করলে তবেই প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, কর্তবাবা-বিবিরা চটতে পারে। মন্দাক্রান্তা সেনের এই লাইনকটা তুলে দিয়ে লেখাটা এখানেই শেষ করি, সত্যি কথাই বলেছেন মন্দাক্রান্তা সেন

> ‘প্রতিষ্ঠানের বুক থেকে দুধ টানছ
> প্রতিষ্ঠানের বুকেই আঘাত হানছ
> বিপ্লবী কবি বলেছে তোমাকে পাবলিক
> আসলে তুমি আগাপাশতলা বানচোদ’ ■

২. তুষার রায়ের কবিতা

কালো মলাটে ঢাকা যে কবিতাগুলি তুষার আমাকে দিয়েছিলেন সেই কবিতাগুলিই এখানে আছে। বানান ও যতিচিহ্ন যা ছিল তাই মোটামুটি রক্ষিত হল। কোনো কবিতায়ই কোনো রকম তারিখ, সময় ও স্থানের উল্লেখ নেই। মোট কবিতার সংখ্যা একশ ছয় ছোট বড় মিলিয়ে। কিছু কবিতায় শিরোনাম ছিল না।

—অজয় নাগ

অপ্রকাশিত তুষার (১৯৮৮)

ছবি: সম্বরণ দাস

একবার

যেমন সমস্ত সমুদ্রের সাধ একবার
ফুঁশে ওঠে ঝঞ্ঝায়, জলস্তম্ভে
তেমনি তো একবার
সমস্ত অমিল ভেঙে ছুঁতে ইচ্ছা তোমাকে কবিতা,
একবার মৃত্যুবাজী রেখে ঝাঁপ ইচ্ছা করে
উন্মুখ অনেক নিচে কাঁচ ও পেরেক-এ

কোথায় রয়েছো বলো,
এ জীবন ঝাঁকিয়ে খুঁজছি

কোথায় রয়েছো বলো, আমি বুক ফুটো করে
রক্তে ছড় টেনে একবার একবারো অন্তত
সব সুর মেলাবো নিখুঁত।

অভিমান

মশায় কেবল তো সাঁইত্রিশ একর
জমি চেয়েছিলাম
চাষ আবাদ আর বাসা বুনতে
তা নাহলে কতোকাল আর
পরগাছায় ডালে

দুলব প্রত্যেকটা ঝড় গুনতে গুনতে
আপনারা তো দেবেন বলেছিলেন
সার, বীজ
বলে, গছিয়ে গেছেন এমন চিজ
আমি তিতবিরক্ত এবং একটু পরেই
ঝড় দাপট দেখাবো
তুহিন চোকলা ভাসা . . .

তুষায় সরার পর কোনো ভালোবাসা
টিকবে না, ফায়ার প্লেস জ্বালতে হবে ঘরেই
আমি ভেসে বেড়াবো যেন ভাসমান ক্ষুর
যতোদূর আপনাদের সীমানা তদ্দুর।

গোধুলি

নেই বা আগেতে ছিলো কেই বা পিছনে
এসব প্রশ্ন যতো অবান্তর ভেবে
চির পাইনের সারি
পাতায় পাতায় শুনে হেসে ওঠে

হাওয়া, হাওয়া ওঠে ঘুলিয়ে উঠেছে লাল ধুলো
পূবের হাওয়ায় দূর ধান ক্ষেতে মহিষ ও গরুগুলো
এরকম উজ্জ্বল বিকেলে ভাবে
খোল ভুষি খড় মাখা গন্ধের বাথান

অথবা সে গভীর দুপুরে নেমে গহীন সে ঝিলে
নাক ভাসিয়ে আধো হাওয়া জলের মধ্যে নাকি
মহিষ দেখতে পায় গভীর মহিষ নাকি সেইখানে
ভূত, ভয় পেয়ে ছুটে চলে আসে
ফিরে আসে গরু মোষ এই পথ

লাল ধূলো মিশে যায় মহিষের গায়ের রঙের
মতো গাঢ় সন্ধ্যায়।

অক্ষরে অক্ষরে

সমস্ত নির্মাণগুলি বেঁচে আছে
মন্দিরে, মঠে, টেরাকোটার আঙুরে।
মিউজিয়ামে ঘুরে গেছে লক্ষ চোখ
ছবি দেখে কীটের মতন পাতা খুঁজেছে বইয়ের
সমস্ত নির্মাণ মৃদু রঙে রেখা সমস্ত অক্ষরে
সেইখানে দ্যুতি জেগে উঠেছে ধেয়ানে।

সেইখানে ফুল ফুটে উঠেছিলো
তুমি, তোমরা কি পড়োনি, পাখায় ওড়ে
ছবি থেকে রং ছন্দ গল্পের ভ্রমর
প্রেরণার সংযোগ বহতা থাকে, মস্তিষ্কের
মধ্যে সাধ জেগে ওঠে সমস্ত অক্ষরে।

অলিম্পিয়াড '৬৯

পূত শিখার মশাল নিয়ে ছুটেছে

ক্রীড়ামোদী ক্রীড়াবিদ
লাখো হাত আন্দোলিত করে
লাফ লাফাও নাফতালি তেমু
দৌড় দৌড় যেন জীবনেরই হার্ডল

ম্লান মুখে, হকিস্টিক-শুধু ব্রোঞ্জ
আবার ভারতে তবে কোন মুখে ফেরা
ওদিকে জনতা ডাকে ভেরা-ভেরা

আমরাও ছুটবোই, লাফাবোই জেনো
পাঁচটি বছর পরে পাঁচ সোনা চাই
ছেলেরা লাফাও,—মেয়েরা সারি দিয়ে দাঁড়াও

আমি সেই পূত শিখার মশাল বহন করব এইবার।

ছবি: সম্বরণ দাস

কম্পোজিশন

পিঙ্ক রংয়ের এক প্রকাণ্ড প্যাকার্ড ঝলকাচ্ছে
পশ্চিম রঙিন পটে
সূর্য তাই পাটে পাটে বন পাহাড় গেরুয়া
সব আলোর মধ্যে জ্বলে ঝলকাচ্ছে মাঠময় পাকা ধান
জলের দিকে তাকানো যায় না
খাণ্ডার এয়োতির সিঁথি যেন
প্যাকেট ভোর সিঁদুর ঢেলেছে, মেঘের ছায়া জলে কাঁপছে
মন্দিরের চূড়া যেন কিংবা যেন শুঁড় ওঁচানো হাতি
দূরের টালিঘর আর টিলাও দ্যাখো ছায়া ফেলেছে

দ্যাখো কেমন জেগে উঠেছে শান্ত উড়ন্ত ব্রীজ
যেখানে পলাশে রঙ্গনে জ্বলছে ফ্লুরসেণ্ট পিঙ্ক রং
প্রকাণ্ড প্যাকার্ড।

সেইখানে

স্নায়ুর সমুদ্র অতলান্ত, রহস্যে গভীর গাঢ় স্বচ্ছ নীল
মাছের রূপালী পেট, করাল সে বাদামী রঙ-এর
যতো হাঙর ক্যাসাল্ট সব দেখা যায় রাত
দিন সমস্ত জীবন যেন অতসী কাঁচের নীচে
সামুদ্রিক ফেনা ও প্রবালময় জলতল
রৌদ্রের রূপানীল ছল ছল ছানার জলের
মতো আলো। সেইখানে গভীর অনন্ত
থেকে বোধির সবিতা ওঠে দীপ্র আলো ছেয়ে
লেপে ল্যাপ্টানো ছয়লাপ আলোর
হে সূর্য। সেইখানে গভীর চাতালে বসে
বন্দনা ও স্তোত্রে আমি ধূপ দীপ জ্বালি।
গাঙ চিল বা সী-গালেরা মেখে নেয়
সে আলোয় ডানা।

মনে পড়ে প্রত্যেকটা এ্যাপয়েনমেণ্টস-ফোন
নম্বর কাজ কারবার মেয়ে-ছেলে
মদ ও ঘোড়ার কথা জ্যাকপট বাজী
সিনে ক্লাব-এর শো আজকে লুই মালের জ্যাজী। ■

তুষার রায়ের ১০৬ টি কবিতাই এখানে প্রকাশিত হবে।

৩. প্রসিদ্ধ বিবেক

কার্ল মার্কস বর্ণিত যে বহুমাত্রিক বিচ্ছিন্নতা আধুনিক সত্তার এক আবশ্যিক দশা তার কোনো পর্যায়ে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি বহুস্তরীয় দেশের বুদ্ধিজীবীরা অবস্থান করছে সেটাকে নির্দেশ করে একটা স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা বোধহয় দরকার। এই বিচ্ছিন্নতা, বলাই বাহুল্য, একটি প্রাত্যহিক উপাদান—অলক্ষ্যে যা ভাবনাচিন্তার নিয়ামক, আপাত স্বাধীনতার অধ্যাসের আড়ালে তা-ই একটি অমোঘ কাঠামো হয়ে রয়েছে তার নিজস্ব রদবদলের ভরবেগে বলীয়ান হয়ে। কীভাবে ব্যাপারটি স্থিতাবস্থার পক্ষে অবস্থান নেয় যখন All that is solid melts into air, all that is holy in profaned কী কারণে তারা মানুষের আশ্রয়ে না যেয়ে ব্যাঙের ছাতার তলায় ভিড় জমায়? এটাই কি সফলতা? প্রসিদ্ধ বিবেকেরা কি জবাবদিহির আওতার বাইরেই থেকে যাবে?

অ্যাকোয়ারিয়াম ● ডিসেম্বর ২০০৯

৪. অলৌকিক কবরখানা

একটি মহাজাগতিক শব্দসম্ভাবনাপূর্ণ অলৌকিক কবরখানা রয়েছে। এখানকার ঋতু চিরস্থায়ী বসন্ত, গাছে দিনের বেলায় দোয়েল-টুনটুনি খেলা করে, রাতে প্রগাঢ় পিতামহীরা কবিতাখেকো ইঁদুরদের ওপর ধরপাকড় চালায়। অজস্র দেশি-বিদেশি নামে উৎকীর্ণ সমাধিফলক। এক্ষণ, সাহিত্যপত্র, শতভিষা, বিচিন্তা, হীনযান, লাল নক্ষত্র, পাহাড়তলি, সুন্দরম . . . কত নাম। জার্মান রোমান্টিক আন্দোলনের পত্রিকা 'এথেনিয়াম' এখানে তো ফরাসি আভাঁ গার্দ পত্রিকা 'Revue Blanche' রয়েছে কাছেই। ওই তো মস্কোর মেজাজগরম 'LEF' যার মাত্র সাতটি সংখ্যা সাকুল্যে বেরিয়েছিল। তেমনই রয়েছে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে বিদ্যমান 'Criterion', ৩০ থেকে ৫০ দশক অবধি পর্যবেক্ষণরত 'Scrutiny', Kraus সম্পাদিত ২৫ বছরের 'Die Fackel', শ্রদ্ধেয় বেনদেত্তো ক্রোচে সম্পাদিত 'La Critica', দুঁদে ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতি বিজড়িত 'Les Temps Modernes' . . . বছরের পর বছর ধরে ঘুরলেও সব সমাধি দেখে ওঠা যাবে না, প্রত্যেকটা একটা করে ফুল দিতে গেলেও দশটা জাহাজ ভাড়া করতে হবে। লিটল ম্যাগাজিন কেন মরে যায়? ঝগড়া হয়, ক্লান্তি পেয়ে বসে, টাকাকড়ির সমস্যা তো কোনোদিনই মেটে না। ভাবতে ভালো লাগে যে এত ঝামেলাঝক্কির পরে ওই অলৌকিক কবরখানায় ভাষাবন্ধনের জন্যেও একটি জায়গা বরাদ্দ। সেঁধিয়ে যেতে পারলে একটা সমাধিফলকও কপালে রয়েছে, তা সে যতই এবড়োখেবড়ো হোক না কেন। ■

অ্যাকোয়ারিয়াম ● অগাস্ট ২০০৯

ODDJOINT # বাংলাব্ল্যাক্

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

আষাঢ় ১৪২২ ● জুন ২০১৫

৫. কবিজীবনী

অ্যালেন গিন্সবার্গ : নিউইয়র্ক : ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬৩
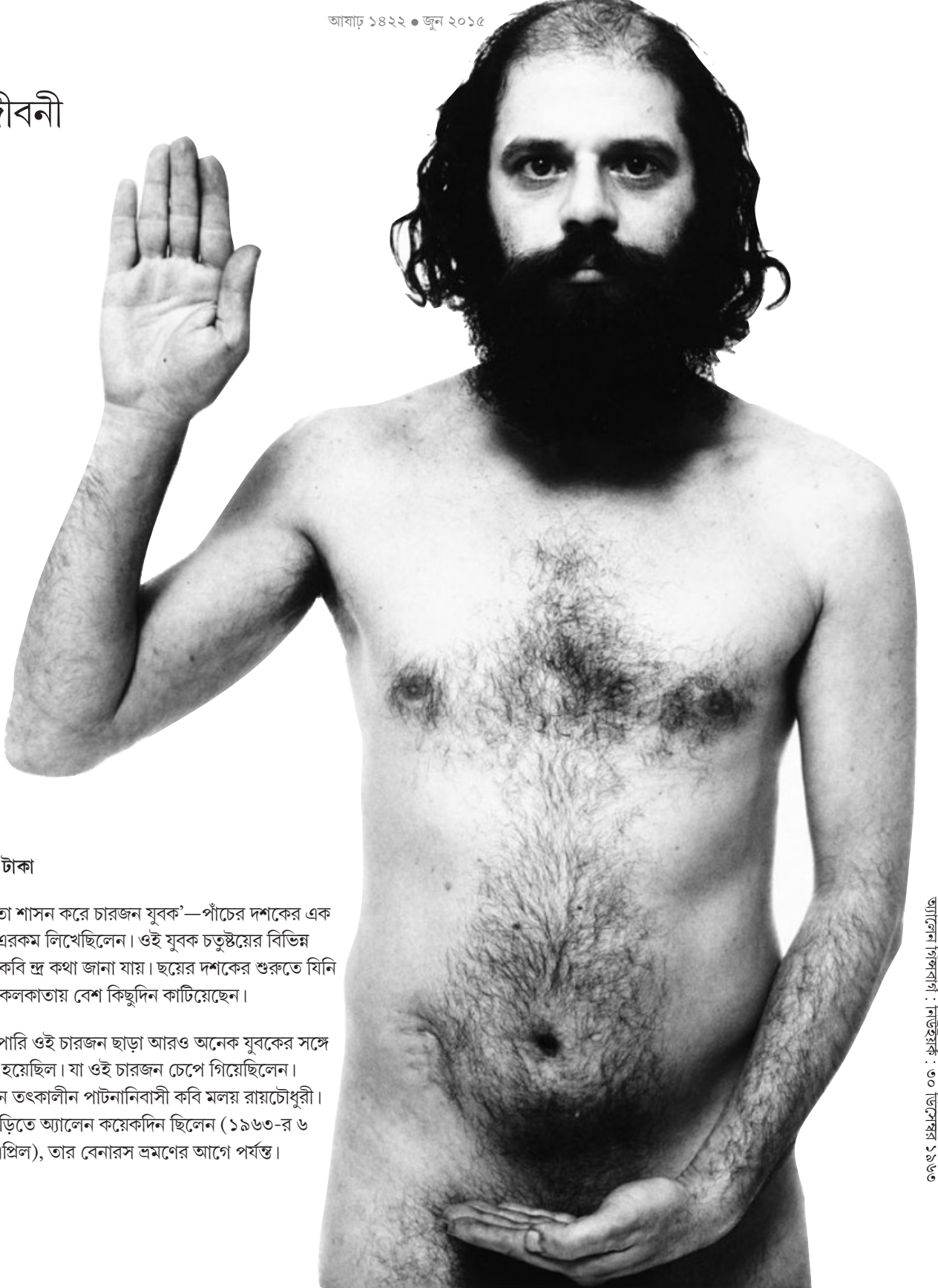
অ্যালেন গিন্সবার্গ
মলয় রায়চৌধুরী

কবিতীর্থ/ দাম ৪০ টাকা

‘মধ্যরাতের কলকাতা শাসন করে চারজন যুবক’—পাঁচের দশকের এক কবি তার কবিতায় এরকম লিখেছিলেন। ওই যুবক চতুষ্টয়ের বিভিন্ন লেখায় মার্কিন বিট কবি ন্দ্র কথা জানা যায়। ছয়ের দশকের শুরুতে যিনি ওই যুবকদের সঙ্গে কলকাতায় বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন।

কিন্তু পরে জানতে পারি ওই চারজন ছাড়া আরও অনেক যুবকের সঙ্গে অ্যালেনের আলাপ হয়েছিল। যা ওই চারজন চেপে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন তৎকালীন পাটনানিবাসী কবি মলয় রায়চৌধুরী। মলয়ের পাটনার বাড়িতে অ্যালেন কয়েকদিন ছিলেন (১৯৬৩-র ৬ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল), তার বেনারস ভ্রমণের আগে পর্যন্ত।

১৯৯৭ সালের ৫ এপ্রিল অ্যালেন যকৃতের ক্যান্সারে মারা যান। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই কবির এক সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছেন মলয়, কলকাতা শহরে বসে।

বাংলা ভাষার পাঠকের কাছে মার্কিন কবি গিন্সবার্গের জীবনীর প্রাসঙ্গিকতা কোথায়—কারোর একথা মনে হতে পারে। সাহিত্যের ধারণার ইতিহাস ঠিক কার্যকারণ নির্ভর নয়। যাটের দশকে অ্যালেন গিন্সবার্গ কলকাতা শহরে কবিতা সম্পর্কিত ধারণার একটা বদল ঘটিয়েছিলেন। সেই বদল কোনো স্থায়িত্ব তৈরি করতে পেরেছে কী না নাকি বাংলা কবিতা, সে বদলকে গ্রাহ্য করেনি—এ বিষয়টি নিয়ে এখন কথাবার্তা হতে পারে।

> ১৯৬২ সালের জুলাই মাস থেকে গিন্সবার্গ ও তার বন্ধু পিটার অরলভস্কি ডেরা নিলেন চাঁদনিচকের আমজাদিয়া হোটেলে। . . . তাঁরা পরিচিত হলেন 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের সঙ্গে। চম্পাহাটি থেকে সাতসকালে বেরিয়ে ইস্তিরি করা গেরুয়া আলখাল্লা-পাগড়ি পরা অশোক ফকির হাজির হলেন আমজাদিয়া হোটেলে, কাঁচা কলাপাতায় মোড়া অনেকখানি আফিম নিয়ে। তিনজনে নেশা করার পর, গিন্সবার্গ ও অরলভস্কিকে নিয়ে তিনি পৌঁছলেন নিমতলা শ্মশানঘাটে। . . . শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকরা তাঁকে কফি হাউস ও খালাসিটোলার সঙ্গে পরিচয় করালে, তিনি তাঁদের শ্মশান ভ্রমণে নিয়ে যেতেন। (পৃ. ২৬)

অশোক ফকিরের দেখানো, চিৎপুরের মুসলমানপাড়ায় হাকিমি কামোদ্দীপক খেয়ে পরখ করলেন। ধুতরো মেশানো ভাঙের শরবৎ আর জর্দা দেওয়া পান খেলেন বড়োবাজারে। মাস্তানদের সঙ্গে গাঁজা ফুকলেন হাওড়া ব্রিজের তলায় বা শ্মশানঘাটে। কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, ঠনঠনে মন্দিরে।

> . . . ডিসেম্বরে অমাবস্যায় গিন্সবার্গ, অলরভস্কি আর শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে তারাপীঠে নিয়ে গেলেন অশোক ফকির। (পৃ. ২৭)

> কলকাতায় ফেরার পর রাধাস্বামী সৎসঙ্গ ও লোকনাথ বাবার শিষ্যরা এসে নিজেদের জমায়েতে নিয়ে গেলেন গিন্সবার্গ ও অরলভস্কিকে। (পৃ. ২৮)

বাংলার লেখক-কবি ও সংস্কৃতির সঙ্গে এতটা যিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে—বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে তাঁর জীবনীর প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চয় আছে। বিশেষত বাংলা সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক কোনো না কোনো সূত্রে গিন্সবার্গের কথা জানেন।

যে অ্যালেন পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে নিজেকে প্রায় সন্ন্যাসী কবি করে তুলেছিলেন—তাঁর জীবনের অর্ধেকটা কেটেছে সমাজজীবনের বিপজ্জনক এলাকায়। ১৭ বছর বয়সে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস থেকে অশ্লীল আচরণের দায়ে বিতাড়িত হওয়ার পর অ্যালেন একটি মেসবাড়িতে আশ্রয় নেন।

> বাড়িটির বাসিন্দাদের মধ্যে নজরে পড়ার মতো ছিলেন সাহিত্যযশোপ্রার্থী জ্যাক কেরুয়াক, মাদক সেবনের প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষাকারী উইলিয়াম বারোজ, সমকামী নিল ক্যাসার্ডি, বাউণ্ডুলে লুসিয়ান কার এবং ছিঁচকে চোর হার্বার্ট হাঙ্কে। কেরুয়াকের কারণে এদের সঙ্গেই হৃদ্যতা হল অ্যালেনের। (পৃ. ৪)

অপরাধী হার্বার্ট হাঙ্কে ও ইতালিয় মাফিয়া সদস্য জ্যাক মেলভির সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকার কারণে ২২ বছর বয়সে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন অ্যালেন। মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন এই অজুহাতে শাস্তি এড়ালেন, অ্যালেনের মা উন্মাদ ছিলেন বলে আদালত তা বিশ্বাসও করল। কিন্তু তাঁকে পাঠানো হয় নিউ ইয়র্ক স্টেট সাইক্রিয়াট্রিক ইনস্টিটিউটে। মানসিক চিকিৎসালয়ে এক কপি 'ভগবদগীতা' সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন অ্যালেন। জেন ক্র্যামার জানিয়েছেন, পুলিশ ও চিকিৎসকরা এই বলে অনুমতি দেননি যে, হিনডু ব্ল্যাক ম্যাজিকের বই ভেতরে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না, কেন না কেবলমাত্র ধর্মগ্রন্থই হাসপাতালে অনুমোদিত।

অস্থির জীবনে অতৃপ্তির উপশম ঘটাতে অ্যালেন মনোচিকিৎসকদের পরামর্শ নিতেন। সেই সময় ফিলিপ হিক্স নামে এক ডাক্তারকে

অ্যালেন বলেন,

. . . আমি চিরকালের জন্য চাকরি-বাকরির বাঁধাধরা জীবন ত্যাগ করতে চাই। আর কখনও এরকম কাজকর্মে আটকে থাকতে চাই না। আমি চুপচাপ আয়েশ করতে চাই, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে চাই, বন্ধুদের সঙ্গে সারাক্ষণ সাহিত্যিক আড্ডা দিতে চাই, দিনভর বসে কবিতা লিখতে চাই। এমনও হতে পারে যে, কোনো মেয়ের সঙ্গে সংসার পাতার বদলে একজন যুবকের সঙ্গে থাকব। আমি নিজের অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে চাই। আপনি একে শহুরে সাহিত্যিক সন্ন্যাসীর জীবন বলতে পারেন। (পৃ. ১৫)

অ্যালেন ছিলেন এরকমই একজন কবি যাঁর জন্য সমাজের কোনো খোপই মানানসই নয়। ১৯৫৬ সালে 'হাউল এ্যান্ড আদার পোয়েমস' প্রকাশিত হওয়ামাত্র অ্যালেনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সেইসময় প্রতি বছর বইটির দশ হাজার কপি মুদ্রণের প্রয়োজন হত। কথাবার্তা কোনোদিনই রেখে ঢেকে বলেননি অ্যালেন।

১৯৬৪ সাল অ্যালেন কিউবা গিয়েছিলেন লাতিন আমেরিকার কবিতা উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে। কিন্তু শিল্পী সাহিত্যিকদের ওপর রাষ্ট্রের দাদাগিরির বিরুদ্ধে বলায় পরের দিনই বিতাড়িত হন। (পৃ. ২৪)

মলয় গিন্সবার্গের যে জীবনী লিখেছেন তাতে কোনোরকম দেবত্ব বা অতিমানবত্ব আরোপ করেননি। তাকে মনে হয়েছে এই মরপৃথিবীরই একজন। বইটির শেষে মলয় গিন্সবার্গের কাব্য ও গদ্য গ্রন্থের তালিকা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, গিন্সবার্গ সম্পর্কিত গ্রন্থের তালিকা, তার ফটোগ্রন্থের তালিকা, রেকর্ড, ক্যাসেট, সিডি-র তালিকা, গিন্সবার্গ সম্পর্কিত ফিলম ও ভিডিও-র তালিকা ও গিন্সবার্গ সম্পর্কিত ১৩টি ওয়েবসাইটের তালিকা পর্যন্ত দিয়েছেন। যাতে উৎসাহী পাঠক গিন্সবার্গ সম্পর্কে আরও জানতে পারেন। খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে গিন্সবার্গের জীবনী লেখার কাজটি মলয় দক্ষতার সঙ্গে করেছেন।

যশ, প্রচার, বিদ্যায়তনিক স্বীকৃতি, প্রভূত টাকাকড়ি, বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধা, ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের ভালোবাসা পাওয়ার পরও, গিন্সবার্গ কিন্তু আধিপত্যবাদের সঙ্গে আপোশ করেননি, অ্যাপলোজেটিক আচরণ করেননি পুরস্কারপ্রাপ্তির আশায়, রফা করেননি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হচ্ছে বলে আর এক প্রস্থ 'হাউল' ও 'ক্যাডিশ' লিখতে বসেননি। (পৃ. ৪৮)

একজন মার্কিনি হিসাবে গিন্সবার্গ বাকি পৃথিবীর কাছে স্বীকারোক্তি করেছেন এই বলে—

ভিয়েতনামের জন্য আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত, ক্যামবোডিয়ায় সিহানুককে সরিয়ে বধ্যভূমি তৈরির জন্য আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত, এল সালভাদোরে সামরিক খুনি বাহিনীর খরচ যোগানোর জন্য আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত, বিশ্ব আদালতের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিকারাগুয়ায় সমুদ্রতীরে বেআইনি খনিজ তোলার জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত, চিলিতে সরকার ফেলে হত্যালীলার জন্য আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত, রেড ইন্ডিয়ানদের মেরে ফেলার জন্য আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত, কয়েকশো বছর ক্রীতদাসপ্রথা বজায় রাখার জন্য আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত। (পৃ. ৪৯) ■

অ্যালেন গিন্সবার্গ

বাংলা বই, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, অক্টোবর ২০০১